ইভা বলেছে সাধারণ লোকজন কখনো তাদের কাজকর্ম ভালো চোখে দেখে না বলে তারা মফঃস্বলের এই নির্জন জায়গায় চলে এসেছে। আজ রাতে অমাবস্যা, রাত বারোটার পর তাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। সব মিলিয়ে তেরোজন, রুমীকে নিয়ে চোদ্দ। এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী তাদের শিশু সন্তানকে নিয়ে আসবে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করার জন্যে। তারা স্বামী-স্ত্রী এই ধরনের ধারণায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু সমাজে থাকতে হয় বলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। সাধারণ মানুষজন সবাই জানে জোয়ারদার তার স্বামী, কিন্তু ইভার সাথে জোয়ারদারের কোনো সম্পর্ক নেই।

অনুষ্ঠান বেশ লম্বা। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হলে সবাইকে গায়ে বিশেষ এক ধরনের তেল জাতীয় জিনিস মাখতে হয়। আজ সারাদিন ধরে সেটা তৈরি হচ্ছে। খাওয়ার জন্যে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের পানীয়, তাতে অ্যালকোহল ছাড়াও আরও অনেক কিছু মেশানো হয়। তাদের এই অনুষ্ঠানে গায়ে কোনো কাপড় না রেখে যোগ দেয়ার কথা, কিন্তু যারা বিদেশে যায়নি তাদের লজ্জা একটু বেশি বলে অনেক সময়ে একটু কাপড় পরে থাকে। ইভার কাছে কেন যেন এই ব্যাপারটা খুব কৌতুককর মনে হওয়াতে সে খিল খিল করে হাসতে শুরু করে। তার সুন্দর মুখে এই মিষ্টি হাসি দেখে কে তাকে কোনো কিছুতে সন্দেহ করবে? হাসি থামিয়ে ইভা রুমীকে অভয় দেয়, তাকে কাপড়ছাড়া থাকতে হবে না, সে তো আর তাদের দলের কেউ নয়—সে হচ্ছে মিডিয়াম। আর গায়ে অবশ্যি সেই বিশেষ তেলটি মাখতে হবে আর সেই পানীয়টা তাকেও খেতে হবে। পানীয়টা নাকি খুব সুস্বাদু, খেতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। রুমী ওদের মাঝখানে বসে থাকবে, সময় হলে ডেভিল তার উপরে ভর করে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। সারারাত ধরে অনুষ্ঠান চলার পর ভোর রাতে ওরা ঘুমাতে যাবে। তখন রুমীর কাজ শেষ, সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে।

ওর কাজ শেষ হলে ও যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে কথাটা রুমী প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল, মানুষ সবসময়েই ভালো জিনিসটা বিশ্বাস করতে চায়, দৈনন্দিন জীবনে সেটা একটা আশীর্বাদের মতই। কিন্তু অঘটনের আগে মানুষ যে সব খারাপ ব্যাপার ঘটতে পারে সেগুলি ইচ্ছা করে না দেখার ভান করে বলেই এতে অঘটন ঘটে। এই সত্যটা রুমী সবসময় মনে রেখেছে, এবারেও সে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বুঝতে পারলো আসলে এরা তাকে ছেড়ে দেবে না। অন্য কোনো কারণে না হোক, সে ঘরে একটা শিশুর মৃতদেহ দেখেছে, তার সামনে আজ রাতে আরেকটা শিশুকে উৎসর্গের নামে হত্যা করা হবে, এই দুই ঘটনার সাক্ষীকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা কিছুতেই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে না। এদের কোনো কোমল অনুভূতি নেই, কাজ শেষ হওয়ার পর তাকে ওরা অবলীলায় হত্যা করবে।

মৃত্যু ভয়ের চেয়ে বড় ভয় কিছু নেই, রুমী পায়ে দাঁড়ানোর জোর পাচ্ছে না। বিছানায় বসে দরদর করে ঘামতে শুরু করে। কোনো কিছু চিন্তা করতে পারছে না সে। ছাড়াছাড়া ভাবে ছেলেবেলার ঘটনা, বন্ধুদের চেহারা, শানুর কথা, বহুকাল আগে শোনা মায়ের গলার স্বর এইসব মনে হতে থাকে ওর। রুমী প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করতে। তাকে মেরে ফেলবেই, এটা কোনো অবধারিত সত্য নয়, কাজেই ওকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কত মানুষ আরও কত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, কাজেই ওর কোনো আশা

নেই এটা ঠিক নয়। রুমী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে বসে। ওর বারবার মনে হয় এটা বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন, এক্ষুণি ঘুম ভেঙে দেখবে ঘরে তার পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছে।

কিন্তু এটা দুঃস্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন থেকে অনেক ভয়াবহ, সেটা বুঝলো অনেক পরে।

For More Books of Humayun Ahamed & Md. Zafar Iqbal, Please Contact at:

Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

www.banglabook.com

চার

রাত ঠিক বারোটা বেজেছে। রুমী উঁচু একটা জায়গায় কালো কাপড়ে ঢাকা একটা চেয়ারে বসে আছে। অদ্ভুত একটা কালো। আলখাল্লা পরানো হয়েছে তাকে, মাথায় কালো লম্বা সুঁচালো একটা টুপি। টুপির দু'পাশে শিঙের মতো খানিকটা বের হয়ে আছে। আলখাল্লার বুকে সাদা চাকার মতো কি যেন আঁকা, তাতে নানারকম উদ্ভট চিহ্ন। ইভা, আরও দুটি মেয়ে এবং একজন নির্লজ্জা বুড়ী তার সারা গায়ে খুব ভালো করে সেই বিশেষ লাল রঙের তেলটি মাখিয়েছে। ইভার কাছে শোনার পর থেকে রুমীর সন্দেহ হচ্ছিল যে এই তেলটিতে কোন ধরনের ওষুধ থাকতে পারে যা তার লোমকূপের ভিতর দিয়ে শরীরে ঢুকে তাকে নেশাগ্রস্তের মতো করে ফেলবে। সেটা যতটুকু সম্ভব বন্ধ করার জন্যে সে তার বুকে পিঠে আর মুখে ধুলোবালি আর দুপুরের অবশিষ্ট খাবারের মাখনটুকু মেখে নিয়েছে। তাতে কোনো লাভ হয়েছে কিনা বলা কঠিন কারণ তেলটুকু মাখানোর পর থেকে তার সারা শরীর আগুনের মতো গরম হয়ে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠছে। শুধু তাই নয় তার প্রচণ্ড ভয়টুকু কমে গিয়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে একটু একটু খুশি খুশি লাগা শুরু হয়েছে। সারাক্ষণ গ্লাসে করে তাকে কি একটা খেতে দিচ্ছে, খেতে সেটা সত্যিই খুব ভালো। রুমী সেটা ঠোঁটে লাগিয়ে খাওয়ার ভান করে সাবধানে নিজের আলখাল্লায় ঢেলে ফেলছে। কালো আলখাল্লা ভিজে গেলেও বোঝা যায় না, তাছাড়া জায়গাটা বেশ অন্ধকার, আলো বলতে মশালের মতো বড় একটা মোমবাতি, একটি করোটির উপর সেটা বসানো। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে বলে এই আলোতে বেশ দেখা যায়। রুমীর পায়ের কাছে তাকে পিছন দিয়ে একটা বৃদ্ধ লোক হাঁটু মুড়ে বসে আছে। তার সামনে একে একে এগারোজন নর–নারী এসে গায়ে গায়ে ঘেঁষে চুপ করে বসে আছে। একপাশে মাটিতে একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে, সকাল থেকেই তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখা হয়েছে। একে উৎসর্গ করার নামে হত্যা করা হবে ভেবে একটু পর পরই রুমীর সারা শরীর শিউরে উঠছে।

কোনো কথাবার্তা নেই, শুধু মোমবাতির শিখাটি একটু একটু শব্দ করে পুড়ছে। মোম গলে করোটির একটা চোখ প্রায় বুজে গিয়েছে। দূরে কোথাও প্রথমে একটা তারপর অনেকগুলি শেয়াল ডেকে উঠলো, তাই শুনে হঠাৎ রুমীর বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

বৃদ্ধ লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি পড়তে শুরু করে দিল, হঠাৎ শুনলে মনে হয় খিস্তি করছে। আসলেও তাই। ঈশ্বরকে, সকল ধর্মকে, সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে, পৃথিবীতে যা কিছু ভালো আছে সবকিছুকে অভিশাপ দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়। বৃদ্ধের সাথে গলা মিলিয়ে অন্যেরাও বিড়বিড় করে কি সব বলতে শুরু করে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো বেশ অনেকক্ষণ চললো এই রকম। এক সময় সবাই থেমে পড়লে বৃদ্ধটি কেশে গলা পরিষ্কার করে অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলা শুরু করে। প্রথমে সে সবাইকে ধন্যবাদ দেয় এখানে আসার জন্যে, তারপর তারা যে কত ভাগ্যবান সে নিয়ে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে। নতুন যারা এসেছে তারা যদিও সবারই পরিচিত তবু তাদের আবারও আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তারা উঠে এসে বৃদ্ধটির যে জায়গায় মুখ লাগিয়ে চুমু খাওয়ার ভান করলো সেটি না দেখলে রুমী কখনো বিশ্বাস

করতো না। একজন একজন করে সবাই স্পষ্ট ভাষায় বললো তারা নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে। তারা সজ্ঞানে এখন থেকে খোদার উপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে শয়তান বা প্রেতকে নিজেদের ভবিষ্যতের প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছে। এরপর প্রত্যেককেই দুই-তিন মিনিট করে সময় দেয়া হলো কিছু বলার জন্যে। তারা প্রথমে এখন পর্যন্ত কি কি অসামাজিক কাজ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ঈশ্বর, সমাজ এবং ধর্মকে এমন জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিল যে তাদের থামানো মুশকিল হয়ে পড়লো। এরপর এদের প্রত্যেকের নাম পাল্টে নতুন নাম দেয়া হলো। এখন থেকে নিজেদের মাঝে তারা এই নামেই পরিচিত হবে। একজনের নাম 'মড়াখাগী', একজন 'রক্তচোষা' অন্যগুলি এত অশ্লীল যে মুখে উচ্চারণ করা যায় না।

দলের নতুন সভ্যেরা বৃদ্ধটির সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। বৃদ্ধটি আবার বক্তৃতার মতো শুরু করে, আমাদের সাথে আজকে আরও পাঁচজন এসে যোগ দিতে পেরেছে এজন্যে আমরা সবাই আনন্দিত। আজকে এ জন্যে অনেক রকম আনন্দের ব্যবস্থা আছে। অনুষ্ঠান শুরু করার আগে তোমাদের, নতুন পাঁচজনের প্রভু শয়তানের কাছে সারা জীবনের জন্যে অঙ্গীকার লিখে দিতে হবে। প্রভু তাহলে তোমাদেরকেও নিজের কাছে টেনে নেবেন। তোমাদের ভাগ্য আমাদের ভাগ্য থেকে অনেক ভালো, অঙ্গীকারে আজকে স্বয়ং প্রভু শয়তান নিজে এসে স্বাক্ষর করবেন। এই সময় সবাই ঘুরে রুমীর দিকে তাকায়, রুমী অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে।

বৃদ্ধটি কোথা থেকে কাগজ বের করে পাঁচজনের হাতে দিয়ে ইংরেজীতে বলে দিতে থাকে কি লিখতে হবে। মোমবাতির কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ওরা লিখতে শুরু করে। একজন ইংরেজী জানে না বলে তাকে বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হলো। প্রভু শয়তানের স্পষ্টতঃই ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সবাই লিখলো যে ওরা প্রতিজ্ঞা করছে আজীবনের জন্যে সবাই প্রভু শয়তানের দাসত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে। তার বিনিময়ে প্রভু শয়তান তাদের ঈশ্বরের কোপানল থেকে রক্ষা করবেন এবং নিজের কাছে টেনে নিয়ে তার প্রচণ্ড ক্ষমতার একটা ক্ষুদ্র অংশ তার মাঝে সঞ্চারিত করে দেবেন। সবাই স্পষ্ট করে লিখলো যদি তারা কোনভাবে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে প্রভু শয়তান তার এবং তার বংশধরের আত্মাকে ইহকাল ও পরকালে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিপীড়ন করতে পারেন।

অঙ্গীকার লেখা শেষ হবার পর ওরা সুঁচ দিয়ে আঙুল ফুটিয়ে রক্ত বের করে সাবধানে কাগজের নিচে স্বাক্ষর করে। বৃদ্ধটি সবার হাত থেকে কাগজগুলি নিয়ে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে বললো, প্রভু শয়তান অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করে তাদের শরীরে একটা চিহ্ন দিয়ে দেবেন, এরপর থেকে তারা পুরোপুরি নিজেদের লোক হিসেবে গণ্য হবে।

বৃদ্ধ লোকটি কি বলতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়। একজনকে, দেখে ঠিক চেনা যায় না কিন্তু রুমীর মনে হলো জোয়ারদারই হবে, একটু সরে গিয়ে কি একটা যেন চালিয়ে দিয়ে গেল। একটু পরেই আস্তে আস্তে ঢাকের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। গমগমে অদ্ভুত একটা শব্দ, কখনো সামনে কখনো পিছনে আবার কখনো ডান পাশ আর বাম পাশ থেকে শব্দ ভেসে আসছে। রুমী স্পীকারগুলি দেখার চেষ্টা করে কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। ঢাকের শব্দ এত জীবন্ত যে রুমীর মনে হতে থাকে ভালো করে তাকালে দেখবে ওকে ঘিরে আদিবাসীরা নাচের তালে তালে ঢাক বাজিয়ে চলছে। অদ্ভুত রহস্যময় ঢাকের শব্দ,

বুকের ভিতরে যে আদিম অনুভূতি লুকিয়ে রয়েছে সেটা টেনে বের করে নিয়ে আসতে চায়। রুমীর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

সবাই নিজেদের গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে সেই সুস্বাদু পানীয়টুকু খেতে শুরু করে। ঢাকের শব্দের তালে তালে সবাই মেঝেতে পা ঠুকছে, ওদের মাথা দুলছে, কেউ কেউ আবার তালে তালে হাত দোলাচ্ছে। আস্তে আস্তে সবাই একজন আরেকজনের পিছনে দাঁড়িয়ে লম্বা সারি করে রুমীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। ঢাকের শব্দের তালে তালে ওদের পা পড়ছে, হাত নড়ছে, মাথা দুলছে। বৃদ্ধ লোকটি হাত থেকে কি যেন ছুঁড়ে দিল আগুনে, দপ্ করে বড় একটা শিখা জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল, আর সাথে সাথে সারা ঘর অদ্ভুত একটা গন্ধে ভরে গেল, মাতৃগর্ভে বুঝি এরকম গন্ধ থাকে।

রুমীর আশ্চর্য এক অনুভূতি হচ্ছে, সবকিছুকে মনে হচ্ছে অবাস্তব ঘোরের মতো। হাত পা হঠাৎ করে ওর শিথিল হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তে আবার টান টান হয়ে উঠতে চায়। মনে হতে থাকে ওর পা দুটি যেন পিছন দিকে ঘুরে যেতে চাইছে। মাথাটা কেন জানি বুকের উপর ঝুঁকে পড়তে চায়, ও চেষ্টা করেও সোজা রাখতে পারে না। ঠোঁট, গলা শুকিয়ে ওর প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেতে থাকে, হাতের গ্লাসের পানীয়টুকু ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করেও তৃষ্ণা কমে না, বুকটা শুকনো মরুভূমির মতো মনে হয়।

ঢাকের শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। ওকে ঘিরে সবাই তখন আরও দ্রুত ঘুরে চলেছে, নাচের ভঙ্গিতে হাত-পা নড়ছে, মাথা দুলছে, দেহ নড়ছে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে সবাই আদিম উল্লাসে ঘুরে চলেছে। একে একে ওদের দেহ থেকে কাপড় খসে পড়ে। মোমবাতির ম্লান আলোতে ওদের ঘর্মাক্ত নগ্ন দেহ চকচক করতে থাকে। ঢাকের দ্রুত লয়ের শব্দের সাথে সাথে ওদের অঙ্গভঙ্গি অশ্লীল হতে শুরু করে, ওরা যেন মানুষ নয়, বোধশক্তিহীন কিছু হিংস্র পশু। নাচতে নাচতে ওরা আহত পশুর মতো দুর্বোধ্য শব্দ করতে থাকে, দেহ দুলিয়ে হাত নেড়ে ওরা রুমীকে আহ্বান করতে থাকে নিজেদের দিকে।

নিজের ভিতর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন টের পায় রুমী। ওর হাত পা যেন অনেক বড় বড় হয়ে গেছে, শরীর থেকে খুলে বেরিয়ে যেতে চায়। সমস্ত শরীরে যেন কাঁটা ফুটছে, সেই সাথে কুলকুল করে ঘামছে সে। প্রচণ্ড গরমে ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে রুমী, তবু কিছুতেই যেন ও বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে না। মুখ খুলে গিয়ে দাঁত বের হয়ে পড়ে হাসির ভঙ্গিতে, চোখ বড় বড় করে তাকায়। মাথাটা ঘুরে যেতে থাকে অদ্ভুত ভাবে কখনো ডান দিকে, কখনো বাম দিকে—চেষ্টা করেও সোজা রাখতে পারে না। ঢাকের শব্দ দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে, ওকে ঘিরে সবাই পাগলের মতো নাচছে, মুখে চিৎকার করে বলছে, আয়-আয়-আয়রে! আয়-আয়-আয়রে!!

রুমীর ভিতরে বহুদূর থেকে কে যেন বলতে থাকে, আসছি, আমি আসছি! ওর চেতনা আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মোমবাতির আলোতে আদিম উল্লাসে নৃত্যরত উলঙ্গ নর-নারী ওর চোখের সামনে আবছা হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। কুৎসিত একটা মুখ সে দেখতে পায়, বীভৎস তার চেহারা। সে মানুষ নয় কিন্তু মানুষের মতো, সে কোনো পশু নয় কিন্তু পশুর মতো। লাল সরু একটা জিভ একবার বের হচ্ছে একবার বড় মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। চোখ দুটি নির্বোধ ছাগলের চোখের মতো নিষ্প্রভ, একদৃষ্টে সে রুমীর

দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভয় পেল রুমী, ভয়, প্রচণ্ড ভয়। এ ভয়ের কোনো সীমা নেই, শেষ নেই। জীবন শেষ হয়ে গেলেও এই ভয় রক্তের মাঝে রয়ে যায়, যুগ যুগ ধরে রক্তের ভেতর দিয়ে এই ভয় বংশধরের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

চিৎকার করে ওঠে রুমী, যত জোরে সম্ভব, ওর গলার শিরা বুঝি ছিঁড়ে যাবে, তবু থামতে পারে না সে।

কানের কাছে কে যেন বললো, লুসিফার! লুসিফার!!

আর কিছু মনে নেই রুমীর।

ভাগ্যিস মনে নেই। অন্য সবকিছু ছেড়ে দিলেও চোদ্দ মাসের যে শিশুটিকে নিজের বাবা মায়ের হাতে এক অন্ধকার জগতের উপাসনায় প্রাণ দিতে হলো সে-ঘটনাটি নিজের চোখে দেখতে হলো না। রুমী কোনদিন জানতেও পারবে না শিশুটির রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে সে যখন খনখনে গলায় অট্টহাসি দিয়ে উঠেছিল, শয়তানের উপাসক ঐ বারোজন নর-নারী পর্যন্ত আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। কিন্তু রুমীর কিছু মনে নেই।

রুমীর খুব ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওর নিজেকে প্রচণ্ড জ্বরে বিকারগ্রস্তের মতো মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ লাগলো ওর সবকিছু মনে করতে। ওর ইচ্ছে করছিল আবার অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু বুকের ভিতর কে যেন তাকে জোর করে জাগিয়ে রাখলো। বারবার কে যেন মনে করিয়ে দিতে থাকে ঃ ওকে বাঁচতে হবে, আর বাঁচতে হলে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। বারবার ওর বোধশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, 'যা হয় হোক' এই ধরনের একটা অনুভূতি ওকে দখল করে নিতে চাইছিল, কিন্তু জোর করে সে নিজেকে জাগিয়ে রাখলো। সাবধানে চোখ খুলে তাকিয়ে পরিবেশটা বুঝতে চেষ্টা করলো সে।

একটা বিছানায় শুয়ে আছে রুমী। ও একা নয়, ওকে জড়িয়ে ধরে ওর পাশে আরও কেউ শুয়ে আছে, ওর বুকের ওপর তার একটা হাত। সাবধানে সে হাতটা সরিয়ে দিয়ে মানুষটাকে দেখতে চেষ্টা করে, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু রুমী বুঝতে পারে ঃ একটি মেয়ে। রুমী আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড ব্যথায় ওর মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইলো। শব্দ করবে না করবে না করেও গলা দিয়ে ব্যথার একটা আর্তধ্বনি বের হয়ে গেল। পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটি ঘুমের ঘোরে কি একটা বলে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে, গলার স্বরে মেয়েটিকে চিনতে পারে রুমী, ইভা। কিন্তু এ নিয়ে রুমীর এখন বিস্মিত হওয়ার মতো অবস্থা নেই। সাবধানে সে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়ায়, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা তার, কোনমতে একটু স্থির হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, অন্ধকারেও জায়গাটি বেশ বোঝা যাচ্ছে। শব্দ না করে ছিটকিনি খুলে সে বের হয়ে আসে, একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ওর সারা শরীর জুড়িয়ে দেয় সাথে সাথে। বাইরে অন্ধকার রাত, পরিষ্কার আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ঝকঝক করছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। ও নক্ষত্র চেনে না, চিনলে বলতে পারতো এখন ভোর রাত চারটা। রুমী সাবধানে বারান্দা দিয়ে হেঁটে উঠনে নেমে পড়ে। ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর ডেকে উঠলো কোথাও, রুমী ভ্রূক্ষেপ না করে দৌড়ানোর চেষ্টা করে। একটা বিরাট মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা, দূরে উঁচু সড়ক আবছা বোঝা যায়। রুমী সেদিকে ছুটতে থাকে। খালি পায়ে হাঁটার

অভ্যাস নেই অনেকদিন, লম্বা আলখাল্লা পায়ে জড়িয়ে যায়, প্রতি পদক্ষেপে ওর মাথা প্রচণ্ড ব্যথায় শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়তে চায়, কিন্তু রুমীর কিছু করার নেই। দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে থাকে ও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর এখান থেকে সরে পড়তে হবে। মাঠটা পার হয়ে উঁচু সড়কে উঠে ও পিছন ফিরে তাকায়, দূরে ঐ ভূতুড়ে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা দুটি তাল গাছ বাড়ির পিছনে, এখান থেকে আবছা আবছা দেখা যায়। জায়গাটা চিনে রাখতে পারলে হতো, কিন্তু রুমীর এখন থামার সাহস নেই। সে রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে, চেষ্টা করে মনে রাখতে রাস্তায় কি পড়ছে। কোনো লোকালয় নেই, একটা গোরস্থান, বহুদূর ফাঁকা রাস্তা তারপর একটা বড় বটগাছ আবার ফাঁকা রাস্তা, রুমী প্রাণপণে ছুটতে থাকে। ওর গায়ে জোর নেই, পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে, প্রচণ্ড ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে পড়তে চাচ্ছে কিন্তু তবু সে থামে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে পারলে বাঁচে।

স্থানীয় থানায় পৌঁছলো রুমী ঘন্টাখানেক পরে। পথে ছোট একটা দোকান পেয়ে সে দোকানিকে ডেকে তুলেছে। দোকানি দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে এই অদ্ভুত পোশাকে এরকম অবস্থায় দেখে প্রথমে কিছুতেই ঝাঁপ খুলতে চায় না। রুমী অনেক কষ্ট করে বুঝিয়েছে নিজের অবস্থা, তখন দোকানি পৌঁছে দিয়েছে ওকে থানায়।

থানার বৃদ্ধ এস. আই. কিছুতেই রুমীর কথা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। চোখ লাল, কথাবার্তা অসংলগ্ন, শরীর থেকে পরিষ্কার মদের গন্ধ বের হচ্ছে, কম বয়সী নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলে তিনি আগেও অনেক দেখেছেন। এর কথা বিশ্বাস করে এখন কে যাবে ভূতের সাধনা দেখত? গায়ের লাল রং আর অদ্ভুত আলখাল্লাটি দেখে অবশ্যি কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করাই স্থির করলেন। রুমীকে রাতটা লক-আপে রাখতে বলে তিনি গেলেন অজু করতে, ফজরের আজান পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে।

রুমীর কথা পুলিসের বিশ্বাস না হওয়ায় তার খুব আশা ভঙ্গ হলো। এতক্ষণ যে শক্তিটি তাকে চালিয়ে এনেছে সেটি এখন ফুরিয়ে গেছে। বসে থাকার ক্ষমতা নেই। ওকে নিয়ে হাজতে রাখবে রাতটা, কিন্তু তাতে ওর কিছু আসে যায় না। ও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো একটা বেঞ্চের উপর। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে, শরীরটা কাঁপছে অল্প অল্প। চোখ ভেঙে ঘুম আসছিল ওর, অচেতন হয়ে পড়ছিল সে। হঠাৎ রুমীর চোখ বিস্ফারিত হয়ে খুলে যায়—ও স্পষ্ট দেখতে পায় সেই বীভৎস কুৎসিত মুখটি ওর মুখের উপর ঝুঁকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, লাল জিভটি বারবার লক লক করে বের হয়ে আসছে মুখ থেকে। ছাগলের চোখের মতো দুটি স্থির চোখ সোজা ওর দিকে তাকিয়ে। রুমীর সারা শরীর কুঁকড়ে গেল ভয়ে, চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলো সে, অমানুষিক সে চিৎকার। চিৎকার বন্ধ করতে পারে না রুমী, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় ওর, একসময় গল গল করে রক্ত বের হয়ে আসে ওর গলা দিয়ে। বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় সে, প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে বেঞ্চের তলায় অন্ধকারে ঢুকে পড়তে।

বৃদ্ধ এস. আই. অজু শেষ না করেই ছুটে এলেন ভিতরে, রুমীর উপর ঝুঁকে পড়ে ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন তাকে, এই ছেলে, এই ছেলে, কি হয়েছে তোমার?

আস্তে আস্তে রুমীর সারা শরীর শিথিল হয়ে আসে, সে মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে থাকে স্থির হয়ে। বৃদ্ধ এস. আই. ওকে টেনে বের করলেন বেঞ্চের তলা থেকে, মাথাটা ঘুরে গেছে অদ্ভুতভাবে, টেনে সোজা করার চেষ্টা করলেন তিনি। আস্তে আস্তে চোখ খুলে গেল রুমীর, আশ্চর্য স্থির একটা দৃষ্টি তার চোখে। সে-দৃষ্টি বৃদ্ধ এস. আইয়ের চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে তার হৃৎপিণ্ড যেন টেনেছিঁড়ে বাইরে নিয়ে এলো। আতঙ্কে শিউরে উঠে লাফিয়ে পিছিয়ে গেলেন তিনি, ইয়া আল্লাহ্! কাঁপা গলায় আয়তুল কুরসী পড়তে লাগলেন বুকে হাত দিয়ে।

খন্‌খনে গলায় অট্টহাসি হেসে ওঠে রুমী, ওর গলা দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে আবার। বৃদ্ধ এস. আই.-এর মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল, হাত বাড়িয়ে একটা টেবিল ধরে কোনমতে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ইদরিস মিয়া তাড়াতাড়ি দশজনকে বলো রাইফেল নিয়ে তৈরি হতে। ড্রাইভারকে ডেকে তোলো—জলদি!

থানার মেঝেতে শুয়ে অট্টহাসি হাসতে থাকে রুমী, কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। হাসপাতালে খবর দেয়া হয়েছে, লোকজন ওকে নিতে আসছে। বৃদ্ধ এস. আই. দশজন সশস্ত্র পুলিসকে পুরোনো একটা জীপে গাদাগাদি করে তুলে সেই ভূতুড়ে বাড়িটি ঘিরে ফেললেন ভোর রাতেই।

ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেল তাঁর বহুদিন পর।

www.banglabook.com

www.banglabook.com

পাঁচ

কিবরিয়া ভাইয়ের অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস, তাই সাত সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে খুব বিরক্ত হলেন তিনি। নিশ্চয়ই খবরের কাগজের ছেলেটা টাকা নিতে এসেছে, খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন চলে যাবে ভেবে, কিন্তু চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই, কড়া নাড়া বন্ধ হয়ে বরং দরজায় লাথি মারার মতো শব্দ হতে থাকে। বাধ্য হয়ে বিছানা থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলতেই তাঁর খাবি খাবার মতো অবস্থা! বাইরে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, আপনার নাম কিবরিয়া চৌধুরী?

হঁ। ঢোক গিলে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কি হয়েছে?

আমার সাথে যেতে হবে আপনাকে, চলুন। পুলিসটি পারলে তাঁকে সেভাবেই নিয়ে যায়।

কিবরিয়া ভাই মিন মিন করে বললেন, একটু বাথরুম থেকে...

তাড়াতাড়ি...পুলিসটা প্রায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

বথরুমের দরজা বন্ধ করে কিবরিয়া ভাই জানালা গলে পালিয়ে যাবেন কিনা ভাবলেন। নিশ্চয়ই তাঁর ইদানীংকার রাজনীতি নিয়ে একটা কিছু হয়েছে। কেন মরতে ঐ সব উগ্র বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন, রাগে দুঃখে তাঁর হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

এমনিতে তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ, প্রতিদিন বাথরুমে পাকা একঘন্টা সময় লেগে যায়। ভয়ের চোটে আজ পাঁচ মিনিটেই সব সমাধা হয়ে গেল। যত্ন করে দাড়ি কামিয়ে একেবারে স্যুট টাই পরে নিলেন। ভালো কাপড় পরা থাকলে লোকজন ভালো ব্যবহার করে, সমাজ ব্যবস্থার এই জঘন্য প্রচলিত নিয়ম মানতে আজ তাঁর এতটুকু দ্বিধা হলো না।

তাঁর চকচকে পোশাক দেখে সত্যি সত্যি পুলিসটা দাঁড়িয়ে পড়ে, ভদ্রভাবে বলে, চলুন স্যার, বাইরে জীপ আছে।

জীপে ওঠার সময় কিবরিয়া ভাই দেখলেন আশেপাশে লোকজন উকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে—বাড়িওয়ালা আবার একটা ঝামেলা না বাধিয়ে ছাড়বে না।

কিবরিয়া ভাইকে থানায় না নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের তিনতলা একটা কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো। বাইরে পুলিস পাহারা, ভিতরে বেশ ক'জন ডাক্তার, পুলিসের বড় বড় অফিসার। কিবরিয়া ভাইকে দেখে একজন এগিয়ে এলো, আপনি কিবরিয়া চৌধুরী?

জ্বী।

একে চেনেন আপনি?

কিবরিয়া ভাই দেখলেন বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে রুমী। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, নাকে অক্সিজেন টিউব, হাতে স্যালাইন, বুকে হাতে কপালে নানা ধরনের মনিটর, দেখে বোঝা যায় না আদৌ বেঁচে আছে কিনা।

চেনেন একে?

চেনেন বলে কি বিপদে পড়বেন কে জানে, মিথ্যা বললে বিপদ হয়তো আরও বেড়ে যাবে। দুর্বল গলায় আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ চিনি। কেন?

পুলিস অফিসারটি সংক্ষেপে তাঁকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলতেই মুহূর্তে তিনি সাহস ফিরে পেলেন। সেই ভূতুড়ে বাড়িতে রুমীর ব্যাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির একটা বই পাওয়া গেছে, লাইব্রেরিতে খোঁজ করে দেখা গেছে এটি কিবরিয়া ভাই নিয়েছেন। সে-রাতের পর রুমীর আর জ্ঞান ফেরেনি, তাই তার পরিচয় জানার জন্যে কিবরিয়া ভাইকে আনা হয়েছে। রুমীকে যখন ঢাকায় আনা হয় তখন তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, নিউরো সার্জনেরা ছয় ঘন্টা অপারেশান করেছেন, তাঁরা বলেছেন এ যাত্রা সে বেঁচেও যেতে পারে। পাঁচদিন হয়ে গেছে এখনো জ্ঞান ফেরেনি, আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে হবে। কিবরিয়া ভাই রুমীর আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়ার ভার নিলেন। পুলিস অফিসারটি তাঁকে অনুরোধ করলেন ব্যাপারটি গোপন রাখতে, খবরের কাগজে পর্যন্ত ঘটনাটি ছাপতে দেয়া হয়নি।

রুমীর জ্ঞান ফিরলো কুড়ি দিন পর। এই কুড়ি দিন কিবরিয়া ভাই প্রেত চর্চা এবং ব্ল্যাক আর্ট সম্পর্কে দেশী-বিদেশী যতোগুলি বই পেয়েছেন সবগুলি পড়ে ফেলেছেন। যতো পড়েছেন ততো তিনি অবাক হয়েছেন এই বিশে শতাব্দীতেও যে এ ধরনের ব্যাপারটা ঘটতে পারে তিনি নিজের চোখে রুমীর অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস করতেন না। রুমীর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকদিন তিনি ওকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন, শেষের দিকে ডাক্তাররা সন্দেহ করছিলেন রুমীর জ্ঞান হয়তো আর নাও ফিরে আসতে পারে, এভাবেই অনির্দিষ্টকাল অচেতন হয়ে থাকবে। তাই যেদিন রুমীর জ্ঞান ফিরে এলো সেদিন কিবরিয়া ভাইয়ের আনন্দের সীমা ছিল না, পরিচিতদের ভিতর রুমীর জন্যেই তাঁর খানিকটা স্নেহ রয়েছে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর রুমীর মুখে পুরো ঘটনা শুনে তিনি প্রেত উপাসকদের উপর প্রচণ্ড খেপে উঠলেন। তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করেন কাজেই ঈশ্বর বা শয়তান যাকে খুশি প্রভু হিসেবে দাবি করায় তাঁর কিছু আসে যায় না, কিন্তু উপাসনার নামে নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা বা নিরীহ ছেলেদের মেরে ফেলার আয়োজন করাটা মেনে নেয়া যায় না। ওদের প্রত্যেককে ফাঁসীতে না ঝোলানো পর্যন্ত তিনি শান্তি পাবেন বলে মনে হয় না। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে ওদের বিচারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেত উপাসকদের কোনো বিচার হলো না। রুমী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগেই প্রেত উপাসকের দল ছাড়া পেয়ে গা ঢাকা দিল, কেন এমন হলো ঠিক জানা গেল না। কিবরিয়া ভাই অনেক চেষ্টা করে শুধু জানতে পারলেন, দেশের খুব একজন বড় হর্তাকর্তার ছেলে প্রেত উপাসকদের সাথে ধরা পড়েছিল, পুরো ব্যাপারটি তাই এতো তাড়াহুড়া করে চাপা দেয়া হয়েছে। ছেলেটিকে পরদিনই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সে এখন ইংল্যাণ্ড না আমেরিকা কোথায় যেন আছে। দণ্ডমুণ্ডের মালিক একেবারে পাষণ্ড নন, রুমীর যেন ভালো চিকিৎসা হয়, এবং চিকিৎসার সব খরচ যেন সরকার বহন করে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটুকু না করলেও চলতো, কারণ কিবরিয়া ভাই খোঁজ নিয়ে জেনেছেন প্রেত উপাসকদের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী প্রমাণ নেই, রুমীর একার বক্তব্য

ধোপে টিকবে না। সাক্ষী প্রমাণ বের করার দায়িত্ব পুলিসের কিন্তু পুলিস এ ব্যাপারে আঙুলও নাড়াবে না, বলা যেতে পারে নাড়াতে পারবে না।

পরের কয়দিন কিবরিয়া ভাই আগুন খেয়ে অঙ্গার বাহ্যি করার যন্ত্রণা বয়ে বেড়ালেন।

*

রুমী অনেক পাল্টে গেছে। তার মস্তিষ্কের অপারেশানের পর অনেক কিছু সে একেবারে ভুলে গেছে, মাঝে মাঝে অনেক ছোটখাটো ব্যাপার চট করে মনে করতে পারে না। একটু বেশি রাত জাগলে কিংবা কোনো ব্যাপারে একটু বেশি চাপ পড়লেই তার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতে থাকে, কোনো পেন-কিলার দিয়ে সেটা বন্ধ করা যায় না। ডাক্তার বলেছেন আস্তে আস্তে নাকি সেরে যাবে। আজকাল সে একটু ভীতু হয়ে গেছে, একা ঘরে ঘুমোতে ভয় পায়।

সে আর কাউকে তার সে-রাত্রির অভিজ্ঞতা খুলে বলেনি। পুরো ব্যাপারটি খুঁটিনাটি সহ ডাক্তার এবং পুলিস ছাড়া শুধু কিবরিয়া ভাই শুনেছেন। ডাক্তার এবং কিবরিয়া ভাই দুজনেই তাকে বুঝিয়েছেন যে প্রেত বা শয়তান সবকিছু বাজে কথা, তার পুরো অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে কয়টি মারাত্মক ড্রাগ। তার রক্তে নাকি কোকেন পাওয়া গিয়েছিল। তাকে যে পরিমাণ ড্রাগ দেয়া হয়েছিল তাতে তার মস্তিষ্ক পাকাপাকি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারতো। কেন হয়নি সেটা একটা বিস্ময়। হতে পারে সে বুকে পিঠে কপালে মাখন লাগিয়ে নিজেকে খানিকটা রক্ষা করেছে, মদের সাথে মিশিয়ে যা খেতে দিয়েছিল সেটাই সে কম খেয়েছে। ঠিক কি হয়েছে বলা মুশকিল, কিন্তু ডাক্তার বারবার বলেছেন তার ভাগ্য খুবই ভালো।

রুমীও নিজেকে তাই বোঝায়। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে ফিরে এসেছে সে। সে-রাতের পর ঐ কুৎসিত মুখটিকে লকলকে জিভ বের করে এগিয়ে আসতে দেখেনি। অনেক কিছু ভুলে গেছে সে, কেন ঐ মুখটিও ভুলে গেল না ভেবে ওর খুব দুঃখ হয়। কে জানে ঐ মুখ হয়তো ভোলা যায় না, ওর স্মৃতি হয়তো রক্তে মিশে থাকে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার জন্যে।

ঠিক রুমীর গা ঘেঁষে একটা গাড়ি এসে থামে। এ ধরনের ব্যাপার ওর আগে ঘটেছে, কিন্তু রুমী কিছুতেই মনে করতে পারে না কবে কোথায় কিভাবে। গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে একটা মেয়ে ওকে ডাকে, রুমী!

সাথে সাথে রুমীর সব মনে পড়ে যায়, ইভা! রুমীর বুক ধক করে ওঠে। পালিয়ে যাবে সে? কিন্তু কোথায় পালাবে?

রুমী!

রুমী ইভার দিকে তাকায়, হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এই প্রকাশ্য দিনের বেলায় কি করবে ইভা? গাড়িতে আর কেউ নেই, রুমী একটু এগিয়ে যায়, কি?

কেমন আছ?

ন্যাড়া মাথায় গজানো অল্প অল্প চুল মস্তিষ্কের সেই অপারেশানের দাগ এখনো ঢাকতে পারেনি, আর তাকে কিনা জিজ্ঞেস করছে সে কেমন আছে! রুমীর ইচ্ছে হলো সে

শব্দ করে হেসে ওঠে, কিন্তু ওর হাসি আসতে চায় না। অবাক হয়ে সে ইভার দিকে তাকিয়ে থাকে, এ কি মানবী?

আমি কাল চলে যাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে—রুমী চুপ করে তাকিয়ে থাকে, এত সুন্দর একটা মুখ, অথচ...

ভয় নেই, আমি আর আসবো না। মিষ্টি করে হেসে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে, জানো? আমার বাচ্চা হবে?

রুমীর কি আসে যায় তাতে? ওকে বলছে কেন?

বাচ্চার বাবা কে জানো?

চমকে ওঠে রুমী, কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, কে?

লুসিফার! লুসিফার আর তুমি! খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে ইভা। হাসি আর থামতে চায় না কিছুতেই। হাসতে হাসতেই হাত নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দেয় ইভা, রাজারবাগের মোড়ে ডান দিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলো রুমী, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে মেয়েটা, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে! রুমীর বিশ্বাস হয় না। ওটা মেয়ে নয় ওটা রাক্ষুসী, ও সব পারে। আবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন এরকম বললো।

কিন্তু রুমীর সাথে ইভার আর কোনদিন দেখা হয়নি।

www.banglabook.com

দ্বিতীয় অংশ
দুঃস্বপ্ন

ছয়

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে রুমীর সাথে কাজ করে আরিফ, হালকা পাতলা সুদর্শন একটা ছেলে। ভারি হাসিখুশি ছেলে আরিফ, সবসময়েই একটা না একটা কিছু নিয়ে হৈ চৈ করছে। পড়াশোনায় খুব মন নেই, সবসময়েই বলছে এ দেশে আর থাকবে না, কি আছে এই পোড়া দেশে? আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং আরও সব বিদেশী কাউন্সিলে ঘোরাঘুরি করে, বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখে বেড়ায়। একবার বিদেশে পৌঁছতে পারলে নাকি বাসন মেজেই অবস্থার পরিবর্তন করে ফেলবে! খুব বড়লোকের ছেলে, "পোড়া দেশের" কোনো দুঃখ কষ্টই কখনো তাকে স্পর্শ করে না, তবু কেন বিদেশে গিয়ে বাসন মাজার এত আগ্রহ আজকাল রুমী খানিকটা বুঝতে পারে। জন্ম হবার পর থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এমন কি এই দেশের পত্রপত্রিকাতেও শুধু বিদেশের প্রশংসাই শুনে এসেছে, ওর দোষ কি? ওদের শুধু এদেশে জন্ম, কিন্তু ওরা এদেশের মানুষ নয়।

এ সপ্তাহের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে রুমীদের হিলিয়াম গ্যাসের স্পেকট্রাম বের করার কথা। হিলিয়াম গ্যাস ভরা ডিসচার্জ টিউবের দুই মাথায় ইনডাকশন কয়েল দিয়ে কয়েক হাজার ভোল্ট দিতে হয়, একটু সাবধানে কাজ করার কথা, হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললে প্রচণ্ড শক লাগে, কারেন্ট কম বলে আর কিছু হয় না। রুমী সুইচ অফ করে তার দুটি লাগাচ্ছিল, হঠাৎ তার স্পষ্ট মনে হলো আরিফ মনে মনে বলছে, দেই শালাকে একটা শক! এত স্পষ্ট মনে মনে কথাটি শুনলো যে রুমী অবাক হয়ে ঘুরে আরিফের দিকে তাকায়, আর আরিফ সত্যি সত্যি সেই মুহূর্তে ইনডাকশন কয়েলটির সুইচ অন্ করেছে।

প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক খেলো রুমী। যদিও অরিফ বারবার বললো সে খুব দুঃখিত, ভুলে সুইচটা অন্ করে ফেলেছে, কিন্তু রুমী ঠিক জানে কাজটা সে ইচ্ছা করে করেছে। আরিফের উপর ঘেন্না ধরে গেল তার।

কিন্তু কিভাবে শুনলো সে আরিফের মনের কথাটা? রুমী এত অবাক হলো যে বলার নয়।

সন্ধ্যার পর রিকশা করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরে আসছিল রুমী। অনেকদিন অপেক্ষা করে একটা আবাসিক জায়গা পেয়ে সে তার ফুপুর বাসা ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল ছুটিতে রোববার বেড়াতে যায়, ফুপু গাল ফুলিয়ে বলেন ভুলেই গেলি আমাদের! বিপদের সময় তো আমিই জায়গা দিয়েছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। নির্বোধ মহিলা, রুমী কিছু মনে করে না।

বুড়ো রিকশাওয়ালার রিকশাটা টেনে নিতে জোর পরিশ্রম হচ্ছে। রিকশার বেল কাজ করছে না। তাই ছোট একটা লোহার শিক দিয়ে ঠুন ঠুন করে বেলটা ঠুকছে একটু পর পর। রুমীর একটু মায়া হলো বুড়ো রিকশাওয়ালার উপর। কে যেন বলছিল রিকশাওয়ালারা নাকি একজন কেরানীর থেকে বেশি টাকা উপার্জন করে। যে কষ্টটুকু করতে হয় ওদের,

তাতে প্রফেসরের থেকেও বেশি টাকা উপার্জন করা উচিত। পৃথিবীটা বড় একচোখা, কাউকে বেঁচে থাকার জন্যে এতো কষ্ট করতে হয়, আবার কেউ...

রুমীর চিন্তার স্রোত হঠাৎ থেমে গেল পিছন থেকে একটা গাড়ি ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে, খুব তাড়া নিশ্চয়ই। রিকশাওয়ালা জায়গা দিতে পাশে সঁরতে পারছে না, পাশে কাদা জমে আছে, একবার চাকা আটকে গেলে টেনে নিতে জান বেরিয়ে যাবে।

বাস্টার্ড! রুমী হঠাৎ পরিষ্কার শুনলো পিছনের গাড়ির লোকটি মনে মনে রিকশাওয়ালাকে গালি দিচ্ছে। ড্যাম রিকশালাওয়ালা...এমন একটা কুৎসিত ইংরেজী শব্দ, বাংলায় এর ভালো প্রতিশব্দ পর্যন্ত নেই। রুমী অবাক হয়ে পিছনে তাকায়, হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর, কিছু দেখতে পেল না।

হারামজাদা—হঠাৎ চমকে ওঠে রুমী, শালা তোমাকে দেখাচ্ছি মজা, এক ধাক্কায় যদি তোমার বাপের নাম না ভোলাই!

কিছু বোঝার আগে পাশ থেকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে রুমী রিকশা থেকে ছিটকে পড়লো মাটিতে, রিকশাওয়ালাকে নিয়ে রিকশা আরও সামনে কাত হয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল ওদের ঘিরে। রিকশার বারোটা বেজে গিয়েছে, কিন্তু রিকশাওয়ালার বিশেষ কিছু হয়নি, হাঁটুর উপর থেকে শুধু খানিকটা ছাল উঠে গেছে। রুমীর হাতে পায়ে সামান্য কাদা লেগেছে কিন্তু কোথাও ব্যথা পায়নি। বুকটা শুধু ধক্ ধক্ করছে অনেকক্ষণ থেকে।

লোকজন গাড়িওয়ালাকে মুখ খারাপ করে গালি দিল, যদি কোনভবে ধরতে পারতো পিটিয়ে মেরে ফেলতো। যাদের গাড়ি আর পয়সা আছে আর যাদের গাড়ি বা পয়সা কিছুই নেই, দুই ভিন্ন দল। এক দলের সাথে আরেক দলের সম্পর্ক শুধু পথেঘাটে, কারো জন্যে কারো মমতা নেই।

রুমীর পকেটে বেশি টাকা ছিল না, যা ছিল তাই রিকশাওয়ালাকে দিয়ে পুলিস আসার আগেই সরে এলো। সে থেকে আর কি করবে?

হেঁটে হেঁটে ফিরে এলো রুমী। কিন্তু কি আশ্চর্য! কি পরিষ্কার শুনলো সে লোকটির কথা!

এলিফেন্ট রোড ধরে হাঁটছিল রুমী হঠাৎ ভারি অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে, আবছা মনে হলো কে জানি বলছে ভাত খাওয়ার পয়সা নেই ওষুধ খাওয়ার শখ! কানে শোনা যায় না, কিন্তু এতো স্পষ্ট শোনার অনুভূতি যে রুমী ভীষণ চমকে ওঠে। একটা ওষুধের দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছে সে, হতে পারে এ দোকান থেকেই কেউ বলছে। রুমী একটু এগিয়ে যায়। আধময়লা সবুজ শাড়ি পরা রোগা কমবয়সী একটি মেয়ে ওষুধ কিনছে। রুমী শুনতে পেল মেয়েটি বললো, খুব জ্বর পোলাডার। ডাক্তার সাব কইছেন চাইরডা বড়ি খাইলেই জ্বর নাইমা যাইবো।

হুঁ। ওষুধ তো জ্বর নামানোর জন্যেই। রুমী স্পষ্ট শুনলো ওষুধের দোকানের লোকটা এই বলেই থেমে গেল না, মনে মনে বললো, লাটসাহেবের পোলা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন!

কি দিয়া খাওয়ামু? পানি দিয়া?

হুঁ। দুইটা বড়ি একবারে।

www.banglabook.com

তয় ডাক্তার যে কইলো একটা কইরা?

মনে মনে অশ্লীল একটা গালি দিল লোকটা। মুখে বললো, একটা করে খাওয়াতে পারো একটু দেরি হবে জ্বর নামতে এই আর কি? দুইটা করে দিলে…

ডাক্তার সাব যে কইলো ছোডু পোলা একটার বেশি যেন না দেই…

লোকটা আবার মনে মনে বিশ্রী অশ্লীল একটা গালি দেয়। মুখে বললো ডাক্তাররা ঐ রকমই বলে। আমি ওষুধ বিক্রি করি আমি জানি না? এরপর মনে মনে যে কথাটি বললো তা শুনে রুমী থ হয়ে যায়, বললো, মাগী তোর এতো চিন্তা কি? তোকে টেরামাইসিন কে দিচ্ছে? অ্যাসপিরিন দিচ্ছি, দুটো করেই খাওয়া, বাঁচার হলে এমনি বাঁচবে।

রুমী আরেকটু এগিয়ে যায়। মেয়েটি বললো, কত দাম?

চোদ্দ টাকা।

কিছু কম নেন। গরীব মানুষ, ঠিকা কাম করি।

থামো থামো! টেরামাইসিনের দাম জানো? ষোলটার দাম ষোল টাকা। তোমার কাছে এমনি দুই টাকা কম নিচ্ছি। মনে মনে বললো, নেট লাভ সাড়ে তেরো টাকা, যা মাগী দুর হ, সারাদিন বিক্রি নাই।

রুমী দোকানের ভিতর ঢোকে, মেয়েটি সরে ওকে জায়গা দিল। লোকটা উৎসুক চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়, রুমী খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, টেরামাইসিনের বদলে অ্যাসপিরিন দিলেন কেন?

দাড়িসহ লোকটার চোয়াল ঝুলে পড়ে অদ্ভুত একটা মাছের মতো দেখাতে লাগলো, রুমী তার জীবনে কোনো মানুষকে এতো অবাক হতে দেখেনি। লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে সামলানোর জন্যে।

নেট লাভ সাড়ে তেরো টাকা, না?

আমি…আমি…আমি…লোকটা খাবি খেতে থাকে।

মেয়েটি হাতে শক্ত করে টাকাগুলি ধরে অবাক হয়ে রুমীর দিকে তাকিয়ে ছিল। রুমী বললো, তুমি এসো আমার সাথে, ওষুধ কিনে দিই। এ তোমাকে অন্য ওষুধ দিচ্ছিল।

লোকটার অবস্থা দেখে সন্দেহের অবকাশ নেই, এতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছে যে প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত নেই। রুমী প্রেসক্রিপশনটি নিয়ে মেয়েটির হাতে দেয়।

কি চোরা, কি সর্বনাইশা চোরা, আবার দাড়ি রাখছে হারামীর বাচ্চায়—মেয়েটি সরু গলায় চিৎকার করে লোকটিকে গালি দিতে শুরু করে, অসুস্থ সন্তানের কথা চিন্তা করে মেয়েটির রাগ কিছুতেই কমতে চায় না। রুমী অনেক কষ্টে মেয়েটিকে শান্ত করে, এখন সে লোকজনের ভিড় জমাতে চায় না। অন্য একটি দোকান থেকে সে ঠিক ওষুধ কিনে দিয়ে মেয়েটিকে বিদেয় করলো।

মেয়েটি যাবার সময় বারবার বললো, সে আল্লাহর কাছে তার জন্যে দোয়া করবে, তার ভালো হবে, গরীবের দোয়া নাকি বৃথা যায় না।

ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় রুমী, হঠাৎ হঠাৎ সে প্রায়ই আজকাল এর ওর মনের কথা শুনে ফেলছে। ভালো ভালো সব লোকজন কি ভয়ানক সব কথা বলে, মনে মনে সে অবাক

হয়ে যায় শুনে। কাউকে সে বিশ্বাস করে না আজকাল, পৃথিবীতে ভালো লোক নেই একটিও, সব ভণ্ড। খ্যাপার মতো হয়ে যাচ্ছিল রুমী, কোনো কিছুতে শান্তি নেই ওর। লোকজনের মনের কথা শোনার ওপর তার নিজের কোনো হাত নেই, তাহলে সে কখনোই কিছু শোনার চেষ্টা করতো না। আজকাল সে একটু আগে থেকে বুঝতে পারে কিছু একটা শুনবে, সেজন্যে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে, কোনকিছু ঠিক করে ভাবতে পারে না, অনেকটা ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার আগের মতো অবস্থা। তার মাঝে হঠাৎ করে সে শুনতে পায় কথাটা, যেন সে নিজেই বলে ওঠে মনে মনে। সে যেন আর রুমী থাকে না, অন্য একজন হয়ে যায়। তার মতো করে কথা বলে, তার মতো করে চিন্তা করে। একদিন কি ভয়ানক ইচ্ছা করছিল একজনকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের সামনে ফেলে দিতে। শেষ পর্যন্ত দেয়নি, হয়তো ঠিক সুযোগটা পায়নি বলে। সে নিজে তখন একটা রেস্টুরেণ্টে বসে চা খাচ্ছে বন্ধুদের সাথে। হঠাৎ করে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় একটি বৃদ্ধ লোকের মুখ, অনাহারে দুঃখে কষ্টে শীর্ণ হয়ে আছে। দেখে ওর কোনো করুণা হয় না, উল্টে প্রচণ্ড রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে, হারামীর বাচ্চা দুনিয়াটা নোংরা করে ফেললি তোরা—দেই শালাকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের নিচে ফেলে! রুমী হঠাৎ একটা ট্রাকের শব্দ শুনতে পায়। দেই শালাকে ফেলে, দেই ফেলে….দেই ফেলে…

হঠাৎ করে রুমী সংবিৎ ফিরে পায়। বন্ধুটি তাকে ডাকছে, কি রুমী, কি হলো তোর?

দরদর করে ঘামছে সে, মুখ চোখ কাগজের মতো ফ্যাকাসে। আস্তে আস্তে বললো, না, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠলো কেমন!

ব্লাড প্রেশার। বন্ধুটির অভিমত দিতে একমুহূর্তে দেরি হয় না, কান আর কপালে গরম লাগতে থাকে না?

হুঁ, অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ে রুমী।

মনে হয় না কেমন চেপে ধরে আছে?

হুঁ।

ব্লাড প্রেশার, পরিষ্কার ব্লাড প্রেশার। লবণ কম করে খাবি। বন্ধুটির বাবা ডাক্তার অথচ তার নিজের ডাক্তারির যন্ত্রণায় কারো দুই দণ্ড সুস্থ হয়ে থাকার উপায় নেই।

রুমী রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়েই বৃদ্ধটিকে দেখতে পায়, ভিক্ষে করছে। শেষ পর্যন্ত ধাক্কা মেরে ফেলেনি তাহলে। রুমী আস্ত এক টাকা লোকটিকে দিয়ে দিল। বৃদ্ধটি হাত তুলে দোয়া করলো রুমীকে। রুমী গলা নামিয়ে বললো, রাস্তার এতো কাছে দাঁড়াও কেন চাচা? গাড়ি একটা ধাক্কা মারে যদি? ঐপাশে সরে দাঁড়াতে পারো না?

বৃদ্ধটি অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে নির্জীব ভাবে বিড় বিড় করে কি যেন বলে একটু সরে দাঁড়ালো। ভাগ্যের কাছে কি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ! হয়তো এর বাবাও ভিক্ষে করেছে, এর ছেলেও তাই করবে।

কথা শোনার সাথে সাথে দেখতে পাওয়াটা আজকাল নতুন শুরু হয়েছে। আগে শুধু আশেপাশের লোকজনের মনের কথা শুনতে পেত, আজকাল অনেক দূরের লোকজনের মনের কথাও শুনতে পায়, কার কথা শুনতে পাচ্ছে জানে না পর্যন্ত। শুধু যে শুনতে পায় তাই নয় সে নিজে কিছুক্ষণের জন্যে ঐ লোকটি হয়ে যায়, তার মতো করে কথা বলে,

তার মতো করে ভাবে এমন কি তার মতো করে দেখে। পরিষ্কার দেখতে পায় কখনো কখনো। হয়তো কারো ভয়ার্ত মুখ, কারো যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা, কিন্তু কি হচ্ছে বলতে পারে না। কখনো কখনো সে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখে যার অর্থ বুঝতে পারে না, মানুষের বা জন্তু জানোয়ারের আশ্চর্য রূপ, অদ্ভুত সব রং, বিচিত্র রকমের গন্ধ, অর্থহীন নানা শব্দ। রুমীর চেহারা খারাপ হয়ে যেতে থাকে ; রাতে ভালো ঘুম হয় না, খেতে পারে না, প্রায়ই হজমের গোলমাল হয়। মেজাজ সবসময়ে খিটখিটে হয়ে থাকে। সবসময়েই ভেতরে অশান্তি, একটা চাপা ভয়, কখন আবার তাকে কি দেখতে হয়, কি শুনতে হয় যা সে দেখতে চায় না, শুনতেও চায় না। রুমী ঠিক করলো, কাউকে এটা বলতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে কি করা উচিত তার। কে জানে, হয়তো সে পাগলই হয়ে যাচ্ছে।

কিবরিয়া ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাকে পেল না। দরজায় একটা চিঠি লিখে দিয়ে এলো, বিশেষ প্রয়োজনে এসেছিলাম, আপনাকে পেলাম না। কাল আবার আসবো, সম্ভব হলে বাসায় থাকবেন।

সময় কাটানোর জন্যে সে তার ফুপুর বাসায় গেল। রাতে খাবার জন্যে জোরাজুরি করায় সে খেয়েই নিলো। অনেকক্ষণ থেকেই তার ভেতরে কেমন একটা চাপা অশান্তি এসে ভর করেছে। থেকে থেকে সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব চেহারা ভেসে ওঠে, নারী পুরুষ শিশু, সবাই দুঃখে কষ্টে জীর্ণ শীর্ণ। হঠাৎ হঠাৎ কে যেন কুৎসিত গালি দিয়ে ওঠে ওর ভেতরে, শুনে সে নিজেই চমকে ওঠে।

হলে ফিরে দরজা বন্ধ করে ঘরের বাতি নিভিয়ে, বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো রুমী। পুকুরে আলোর প্রতিফলন পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তির তির করে কাঁপছে নারকেল গাছের পাতা আর কেমন চুপচাপ হয়ে আসছে চারদিক। রুমীর ঘুম ঘুম লাগতে থাকে, কিন্তু ঘুমোতে পারে না। ভেতরে কেমন জানি একটা চাপা উত্তেজনা। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো অবস্থা, কিছু একটা হবে এখন, ও বুঝতে পারে ; রুমীর স্নায়ু অপেক্ষা করে আছে।

খুব আস্তে আস্তে হলো পুরো ব্যাপারটা। প্রথমে ছাড়াছাড়া ভাবে স্বপ্ন দেখার মতো তারপর খুব স্পষ্টভাবে, এতো স্পষ্ট যে রুমীর সারা শরীর শিউরে ওঠে।

সে হাঁটছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটছে অন্ধকারে। অদ্ভুতভাবে হাঁটে সে, ডান পা-টা একটু টেনে টেনে, প্রতি পদক্ষেপে কোমরের কাছাকাছি কোথায় যেন ব্যথা করে ওঠে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখে এদিক ওদিক। অন্ধকার বাড়ি, বন্ধ দোকানপাট। রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা পথের লোকজন দেখে বিতৃষ্ণায় ওর ভিতরটা বিষিয়ে ওঠে। অবাক হয়ে রুমী দেখলো কি সহজে সে কুৎসতি একটা গালি দিল ওদের।

মন ভালো নেই ওর, প্রচণ্ড রাগ যেন কার ওপরে। ইচ্ছে করে কাউকে লাথি মেরে ফেলে দেয় কোথাও, কারো টুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে আসে। তার ওপর কোমরের কাছে সেই ব্যথা, প্রতি পদক্ষেপে ওর সারা শরীর যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে, ভয়াবহ যুক্তিতর্কহীন অন্ধ রাগ। একজন বুড়ো এগিয়ে আসে কোথা থেকে, যেন অন্ধকার ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে। ভয়ানক চমকে ওঠে সে, আর রাগটা বেড়ে যায় হাজার গুণ।

বাবা, একটা টাকা দিবেন বাবা? সারাদিন খাতি পাইনি।

খাওয়াচ্ছি তোকে, দাঁতে দাঁত চিবিয়ে মনে মনে বললো রুমী, খাওয়াচ্ছি, তোকে এমন খাওয়াবো যে আর খেতে চাবি না।

বহুদূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা যায়, একটা গাড়ি আসছে, কিসের গাড়ি? রুমীর হৃৎস্পন্দন হঠাৎ বেড়ে যায় দশগুণ।

বৃদ্ধটি আবার হাত পেতে দাঁড়ালো। দিবেন, বাবা?

দাঁড়াও। গলার স্বর শুনে রুমী অবাক হয়ে ভাবে কি চমৎকার ভরাট গলার স্বর। বৃদ্ধটি দাঁড়িয়ে থাকে আশা নিয়ে। দূর থেকে গাড়িটা এগিয়ে আসছে আরও কাছে, ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন, ওটা একটা ট্রাক।

বাবা...

এক মিনিট, পকেটে হাত ঢোকায় রুমী। রক্তের কল্লোল শুনতে পায় সে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

ট্রাক আরও কাছে এগিয়ে আসে।

আরও কাছে...

আরও কাছে...

এইবার! প্রচণ্ড ধাক্কায় বৃদ্ধটি ছিটকে গিয়ে পড়ে ট্রাকের সামনে। প্রাণপণে ব্রেক কষার চেষ্টা করে ট্রাক ড্রাইভার, কিন্তু বৃদ্ধটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রায় তিরিশ ফুট দূরে গিয়ে থামে অতিকায় ট্রাক।

ছুট, ছুট, ছুট, প্রাণ নিয়ে ছুট, ধরা পড়ার আগে ছুট। ডান পা-টা টেনে টেনে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো রুমী। ঐ তো যাত্রাবাড়ির মোড়, সাঁকোটা পার হলেই মিশে যাবে সে ছোট ছোট ঝোপঝাড় আর বাড়িঘরের মাঝে। ছুট ছুট ছুট প্রাণপণে ছুট। পিছন ফিরে তাকালো একবার, ট্রাকটা ছেড়ে দিয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে ট্রাক ড্রাইভার।

হা হা করে হেসে উঠলো রুমী, পালিয়ে যাচ্ছে সে ভয় পেয়ে। প্রচণ্ড হাসির দমকে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। পা টন্ টন্ করছে ওর, হাঁটু চেপে বসে পড়লো মাটিতে। পেট চেপে হাসতে থাকলো বসে বসে, হাসি আর থামানো যায় না—কিছুতেই থামানো যায় না।

প্রচণ্ড আঘাতে যেন ঘুম ভাঙলো রুমীর, অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে সে পাগলের মতো হাসছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, বুক ধক্ ধক্ করছে, যেন এখনি ফেটে যাবে, উঠে বসতে গিয়ে ওর মনে হলো ওর মাথা ছিঁড়ে যাবে প্রচণ্ড ব্যথায়। আবার শুয়ে পড়লো রুমী। বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করে দেখলো, রাত দেড়টা বাজে।

কি করবে সে? একটা মানুষকে ও খুন হতে দেখলো, এখন সে কি করবে?

সে কি খুন করেছে? না, না, কিছুতেই না!

তাহলে ওরকম দেখলো কেন? সব নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন, ভোর হলে দেখবে সব স্বপ্ন।

প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় রুমী কাটা মুরগীর মতো ছট্‌ফট্ করতে থাকে তার বিছানায়।

সারারাত ছট্‌ফট্ করে ভোরের আলো ফোটার পর রুমী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা দুপুর হয়ে গেছে। সকালে এর মাঝে দুটি ক্লাস হয়ে গেছে। এমনিতে সে এমন কিছু নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া ছাত্র নয় তবু আজ ওর যাবার ইচ্ছা ছিল,

একটা ভালো বিষয় পড়ানোর কথা। কিন্তু এ নিয়ে তার মাথা ঘামানোর অবসর নেই, প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে, কিন্তু এতক্ষণে কেন্টিনও বন্ধ হয়ে গেছে। রুমী উঠে হাত-মুখ ধুয়ে গত রাতের কথা ভাবলো, রাতের অন্ধকারে যে ঘটনাটা এতো ভয়াবহ মনে হচ্ছিল দিনের আলোতে সেটাকে অনেক অবাস্তব এমন কি খানিকটা ছেলেমানুষী মনে হতে থাকে। নিশ্চয়ই একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছে সে, এ নিয়ে এতো ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। যদিও সে প্রাণপণে ব্যাপারটি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল, তবু ওর ভেতরে কোথায় জানি খুঁতখুঁত করতে থাকে।

রুমী পাশের একটা রেস্টুরেন্টে চা নাস্তার অর্ডার দিয়ে রেস্টুরেন্টের খবরের কাগজটি নিয়ে এক কোনায় আরাম করে বসে। মধ্যপ্রাচ্যে আবার নতুন ঝামেলা বেধেছে, ব্যাংককে প্লেন হাইজ্যাক, আফ্রিকাতে খাদ্যাভাব এই ধরনের খবরগুলিতে চোখ বোলাতে বোলাতে রুমী নিজের অগোচরে যাত্রাবাড়িতে ট্রাক দুর্ঘটনার খবরটি খুঁজতে থাকে। রুমী আগে কখনো লক্ষ্য করে দেখেনি যে প্রতিদিন অনেকগুলি করে মানুষ দুর্ঘটনায় মারা যায়, বেশির ভাগই ট্রাক দুর্ঘটনা। সারা খবরের কাগজ খুঁজেও যাত্রাবাড়ির ঘটনাটা না পেয়ে রুমী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। রাতের ঘটনা পরদিন ভোরেই কাগজে পাওয়া যায় কিনা এ নিয়ে সন্দেহটুকু সে জোর করে সরিয়ে রাখলো।

নাস্তা শেষ করে সে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা আরামের ভঙ্গি করে চেয়ারে হেলান দিয়ে পকেটে হাত দেয়। সিগারেট খাওয়া আজকাল বেশ রপ্ত হয়ে গেছে, চায়ে চুমুক দিলেই ওর আজকাল সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়ে যায়। খবরের কাগজটি ভাঁজ করে সরিয়ে রাখতে গিয়ে ওর চোখে পড়ে খবরের কাগজের নিচে ছোট ছোট করে লেখা, শেষের খবর ঃ গত রাতে যাত্রাবাড়িতে এক ট্রাক দুর্ঘটনায় জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। শেষ খরব অনুযায়ী ট্রাক ড্রাইভার পলাতক।

রুমী স্তব্ধ হসে বসে রইলো, হাতের সিগারেটের ছাই লম্বা হয়ে জমে এক সময়ে টুক করে ভেঙে ওর কোলের উপর পড়ে, তবু ওর সিগারেট টানার কথা মনে পড়ে না।

প্রচণ্ড রোদ, গরমের হল্কা ছুটছে যেন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে রুমী হেঁটে বেড়ায় রাস্তা ধরে। কেমন একটা চাপা অভিমান ওর বুকের ভিতর গুমরে উঠছে। ইচ্ছে করে কোথাও বসে হু হু করে খানিকক্ষণ কেঁদে নেয়। কেন সে এরকম হয়ে গেল, কি দোষ তার? কি করেছে সে? এতটুকু শান্তি নেই ওর ভিতরে। সেই ভয়াবহ রাতে তার উপর যখন প্রেতের আবির্ভাব হয়েছিল তারপর থেকে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। এতদিন সে কিছু বিশ্বাস করেনি, ভেবেছে ডাক্তারের কথাই ঠিক, মারাত্মক যত ওষুধ তাকে ভয়াবহ সব অনুভূতি দিয়েছে। এখন সে আর ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করে না। হয়তো সত্যিই তার উপরে প্রেতের আবির্ভাব হয়েছিল, সে-প্রেত কখনো ফিরে যায়নি, তার ভিতরে রয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সে নিজেও এখন প্রেতের মতো হয়ে যাচ্ছে, সব অশুভ ব্যাপার সে দেখতে পায়, শুনতে পায়, বুঝতে পারে। কোনো ভালো জিনিসের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে শেষ হয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন সে রমনা পার্কের কাছে চলে এসেছে। কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় দেয়ালের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ হঠাৎ একটু বাতাস এসে ওর সারা শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ একটা সিগারেট খাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখে কটু স্বাদ,

দুই টান দিয়েই সে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ছোট অর্ধোলঙ্গ একটা বাচ্চাছেলে সেটা তুলে নিয়ে গভীর পরিতৃপ্তির সাথে টানতে টানতে হেঁটে চলে গেল। কতই বা বয়েস বাচ্চাটার অথচ এখনই তার কত দায়িত্ব। মাথায় একটা টুকরি, হয়তো পাতা কুড়ায়, হয়তো কিছু ফেরি করে বেড়ায়। কি একচোখা পৃথিবী, এই বাচ্চাটির এখন মাথায় টুকরি নিয়ে রোদের মাঝে আরেক জনের ফেলে দেয়া সিগারেট খেয়ে আনন্দ পাবার কথা নয়, স্কুলে বসে পড়ার কথা, দুরন্তপনা করার কথা, মায়ের সাথে মান অভিমান করার কথা...

রুমী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তবু তো বাচ্চাটি তার থেকে সুখী! সে তো সিগারেটটা পর্যন্ত খেতে পারলো না।

আপনি কিভাবে জানেন?

আমি দে-দেখেছি।

কিভাবে দেখেছেন?

রুমী একটু ভেবে বললো, আমি ওখানে ছিলাম।

রাত কয়টা তখন?

একটা দেড়টা হবে।

এতো রাতে ওখানে কি করছিলেন?

রুমী কুলকুল করে ঘামতে থাকে। থানার পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ কি ভেবে হুট করে থানার ভিতর ঢুকে পড়ে সে শুধু জানতে চেয়েছিল, যাত্রাবাড়ির অ্যাকসিডেন্টে ড্রাইভার ধরা পড়েছে কিনা। নিরপরাধ ড্রাইভার ধরা পড়লে সে হয়তো নিজে থেকেই বলতো ড্রাইভারের কোনো দোষ নেই। কিন্তু তাকে কিছু না বলে বসিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ, একটু উত্তেজনা লক্ষ্য করেছে। তারপর মধ্যবয়স্ক একজন তাকে জেরা করতে শুরু করেছেন। রুমী যা জানতো সব বলেছে, শুধু সে যে নিজের ঘরে বসে পুরো ব্যাপারটি ঘটতে দেখেছে সেটা বলেনি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না তাই। পুলিস অফিসারের ঠিক সেখানেই আপত্তি, এতো রাতে ঐ রাস্তায় কি করতে গিয়েছিল সে, ঘুরেফিরে শুধু ঐ কথাটিই জিজ্ঞেস করছেন। রুমী বলেছে এমনি ওখানে হাঁটছিল, পুলিস অফিসার সেটা বিশ্বাস করতে চান না।

বলুন কেন গিয়েছিলেন ওখানে।

এমনি হাঁটতে।

এতো রাতে?

হ্যাঁ। ঘুম আসছিল না তাই হাঁটতে বের হয়েছিলাম।

হেঁটে যাত্রাবাড়ি গিয়েছেন?

রুমী একটু থতমত খেয়ে বললো, হ্যাঁ।

হেঁটে?

হেঁটে। রুমী বুঝতে পারে আস্তে আস্তে সে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। একটি মিথ্যা কথা বললে সেটিকে বাঁচানোর জন্যে আরও দশটি মিথ্যা বলতে হয়। সে মিথ্যা ভালো বলতে পারে না, অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারের নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে বাকি নেই। রুমী কুলকুল করে ঘামতে থাকে।

ক'টার সময় হল থেকে বের হয়েছেন?

ঠিক জানি না। ঘড়ি দেখিনি।

তবু, আন্দাজ?

সাড়ে বারোটা হবে।

কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে আপনাকে বের হতে?

জানি না। রুমী শুকনো গলায় বললো, এতো রাতে সবাই শুয়ে পড়ে।

কেউ দেখেনি তাহলে, পুলিস অফিসার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন, যে লোকটি বুড়োটিকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের নিচে ফেলেছে তার গলার স্বর কি রকম?

ভরাট স্বর, বেশ ভালো।

তার কথা স্পষ্ট শুনেছেন?

হুঁ।

কি বলেছে সে?

বলেছে, একটু দাঁড়াও তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বের করার ভান করেছে।

কতো কাছে থেকে ওর কথা শুনেছেন?

রুমী ঢোক গিলে বললো, এই দশ বারো হাত।

এতোদূর থেকে স্পষ্ট শুনেছেন ওর কথা?

তাহলে হয়তো আরও কাছে ছিলাম।

কতো কাছে? দেখিয়ে বলুন।

রুমী অনিশ্চিতের মতো একটা দূরত্ব দেখালো, যেটুকু দূর থেকে কথা শোনা সম্ভব।

এতো কাছে?

রুমী মাথা নাড়লো।

সে আপনাকে দেখেনি?

না।

পুলিস অফিসার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে টানতে থাকেন। এক সময় সিগারেট নামিয়ে ঘুরে ওর দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, কেন মিথ্যে কথা বলছেন?

রুমী ভীষণ চমকে ওঠে, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারে না। আমতা আমতা করে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিস অফিসার কঠোর স্বরে ওকে থামিয়ে দেন, ট্রাক ড্রাইভারকে আজ ভোরে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সে বলেছে, কে একজন ধাক্কা মেরে বুড়োটিকে ট্রাকের নিচে ফেলে দিয়েছে।

রুমী উত্তেজিত হয়ে বললো, বললাম না, আমি বললাম না...

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে পুলিস অফিসার, ট্রাক ড্রাইভার বলেছে সে তার হেডলাইটে স্পষ্ট দেখেছে সেই লোকটিকে। একা ছিল সে, ধারে কাছে কেউ ছিল না।

রুমী ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে পুলিস অফিসার কি সন্দেহ করছেন। অসহায় ভয়ের একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড বেয়ে মাথায় উঠে আসতে থাকে। সে শুনতে পায় পুলিস অফিসার আস্তে আস্তে বলছেন বুড়োটিকে কেন খুন করেছেন?

পুরোপুরি ভেঙে পড়লো রুমী।

পরদিন কিবরিয়া ভাই হাজতে রুমীর সাথে দেখা করতে এলেন। এক রাতে তার বয়েস দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। শক্ত মেঝেতে কুটকুটে কম্বলে গা ঘিন ঘিন করা দুর্গন্ধ, ভ্যাপসা গরম, মশা আর ছারপোকার কামড়। হাজতবাসী অন্যান্যদের হাসি মস্করা সবই সহ্য করা যায়, কিন্তু খুনের অপরাধে তাকে ধরে রাখা হয়েছে এই চিন্তাটি তাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। রুমী কিবরিয়া ভাইকে নিজের অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিবরিয়া ভাই গুম হয়ে শুনলেন, তবে কোনো কথা বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না। রুমী খুন করেছে সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু একেবারে বিনা কারণে পুলিস তাকে অ্যারেস্ট করবে কেন? কিবরিয়া ভাই বেশিক্ষণ থাকলেন না, তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন, জামিনের বন্দোবস্ত করে আবার ফিরে আসবেন বলে গম্ভীর মুখে বিদায় নিলেন। রুমী আবার দুর্গন্ধময় অন্ধকার হাজতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকা পড়ে গেল।

এক কোনায় বসে কয়জন তাস খেলছে। মনে হয় এরা ঘুরেফিরে প্রায়ই আসে এখানে। দু'একজনের পুলিসের সাথে ভালো খাতিরও আছে, পান সিগারেট কিনিয়ে আনে ওদের দিয়েই। উচ্চৈঃস্বরে হাসে, কুৎসিত গালাগালি দিয়ে ওঠে একটু পর পর। আশ্চর্য এক জগতের লোক ওরা, রুমী ভয় পেয়ে যায় ওদের দেখে। ওর গা ঘেঁষে এসে বসে বারবার, অশ্লীল রসিকতা করে ওকে নিয়ে। এখানে বেশিদিন থাকতে হলে রুমী পাগল হয়ে যাবে। বিভিন্ন ধরনের লোকজন আছে এখানে। কয়জন প্রচণ্ড মার খেয়েছে, রক্তাক্ত শরীর বীভৎসভাবে ফুলে আছে। একজনের মাথায় টুপি, হাজতের ভিতর নির্বিকার ভাবে নামাজ পড়লো একবার। কয়েকজন বেশ অল্পবয়সী, তাদের ভিতর একজন ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। একজন পাঞ্জাবী আর চশমা পরা ছেলে শান্তভাবে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে, রুমী কথা বলার চেষ্টা করে বেশি সুবিধা করতে পারলো না।

রাত গভীর হয়ে এলে একজন দুজন করে এখানে সেখানে শুয়ে পড়ে। গুমোট গরম আর ভ্যাপসা গন্ধে হাজতের ঘিঞ্জি ঘরটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। রুমী দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরের ঐ সাধারণ পথঘাট বাড়িঘর তার কাছে কতো অচেনা বলে মনে হতে থাকে। কে জানে কিবরিয়া ভাই জামিনের ব্যবস্থা করতে পারলেন কিনা। বসে থাকতে থাকতে এক সময়ে তার চোখে ঘুম নেমে আসছিল, হঠাৎ কে জানি তার ভিতরে একটা কুৎসিত গালি দিয়ে ওঠে। রুমী ভয়ানক চমকে লাফিয়ে উঠে বসে। ঐ লোকটা! কিভাবে সে বুঝতে পারে জানে না, কিন্তু তার কোনো সন্দেহ থাকে না।

ধরতে হবে লোকটাকে, যেভাবে হোক ধরতে হবে। কিভাবে ধরতে হবে জানে না সে, এর আগে কখনো চেষ্টা করেনি, কিন্তু আজ তাকে চেষ্টা করতেই হবে। মাথা ঢেকে সে শুয়ে পড়ে তারপর সমস্ত মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় একত্র করে লোকটার কথা ভাবতে থাকে, তার মনের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে। হাজত ঘরে চাপা গলার স্বর, অশ্লীল গালির শব্দ—দূরে কোথাও ঘন্টা বাজিয়ে একটা দমকল চলে গেল। ছাদে কোথায় কবুতর বাসা করেছে, বাকবাকুম বাকবাকুম শব্দে প্রেয়সীর মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করছে। বাইরে একটা

সেপাই হাতের রাইফেল মেঝেতে ঠুকে ঠুকে একটানা একটা শব্দ করে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে রুমীর মনে হতে থাকে সে যেন ভেসে চলে যাচ্ছে—সব শব্দ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কাছে। সে দূরে আরও দূরে চলে গেল, সব শব্দ আস্তে আস্তে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে একসময় একেবারে মিলিয়ে গেল।

...হাঁটছে রুমী। ফাঁকা অন্ধকার রাস্তা ধরে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে সে পা টেনে টেনে হাঁটছে। প্রতি পদক্ষেপে ওর সারা শরীর ব্যথায় শিউরে উঠছে, রাগ ফুঁসে উঠছে ভেতরে। এদিক সেদিক ওর চোখ নড়ছে দ্রুত, মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, দুর্বল নিরীহ মানুষ। ওর ভেতরকার রাগটা ঝাড়তে হবে কারো ওপর। ইচ্ছে করছে কাউকে ধরে পশুর মতো নির্যাতন করতে। কিন্তু কিভাবে করবে? ওর সে-ক্ষমতা কই? শক্ত লাঠিটার স্পর্শ পেয়ে ওর হাত নিশপিশ করতে থাকে—আহ্! কারো মাথার ওপর যদি বসিয়ে দিতে পারতো সজোরে, খুলিটা ফাটিয়ে দিতে পারতো এক আঘাতে...

মালিবাগ....মালিবাগ....মালিবাগ....একটা রিকশাওয়ালা ডাকছে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, কাউকে পেয়ে গেলে আর খালি রিকশা নিয়ে যেতে হয় না। রুমী রিকশাওয়ালার দিকে তাকায় না। খুব বেশি জোয়ান এই রিকশাওয়ালাটা। হাতে পায়ে শক্ত পেশী, সাপের মতো কিলবিল করছে শক্তির প্রাচুর্যে। একে দিয়ে হবে না। লাঠিতে ভর দিয়ে রুমী আবার হাঁটতে থাকে।

রাস্তার পাশে গাছের নিচে ছোট একটা খুপরিতে চায়ের দোকান। ইটের উপর বসে এক বুড়ো চা খাচ্ছে সেখানে, পাশে তার খালি রিকশা। দুর্বল বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে ওর ভিতরে লোভ জেগে ওঠে। একে একবার চেষ্টা করে দেখা যায়, পায়ে ওর ব্যথা কিন্তু হাত দুটি তো ঠিক আছে, দুহাত একত্র করে পিছন থেকে মাথায় মারতে পারলে এক ঘায়ে কাজ শেষ হয়ে যাবে। জিভে পানি এসে গেল ওর।

যাবে নাকি রিকশা?

না, স্যার। বুড়ো চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির শব্দ করে।

চলো না, এতো রাতে রিকশা কোথায় পাবো?

পাবেন, স্যার, একটু হাঁটেন তাইলেই পাবেন।

হাঁটতে পারছি না বলেই তো বলছি, পায়ে ব্যথা আমার। চলো, তোমাকে দুই টাকা বেশি দেবো।

কই যাবেন?

ইন্দিরা রোড।

লোকটার যাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু সে জোর করলো। পায়ের ব্যথা এবং টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করালো।

কি উত্তেজনা! রুমীর ভেতরটা আনন্দে নেচে ওঠে, আর খানিকটা গেলেই অন্ধকার নির্জন অংশটুকু, তখন দু'হাত শক্ত করে লাঠিটা ধরে মাথার পিছন থেকে দেবে এক ঘা। আনন্দে খিক খিক করে হেসে ওঠে সে।

ঠুন ঠুন করে রিকশা চালিয়ে যাচ্ছে রিকশাওয়ালা, ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করেনি। অন্ধকার রাস্তায় তাড়াতাড়ি চালাচ্ছে সে, মাঝে মাঝে গুণ্ডারা নাকি এখানে হামলা করে। পিছনের সীটে বসে রুমী দুই হাতে ধরে লাঠি উপরে তুললো, তারপর প্রচণ্ড এক ঘা।

ছোট একটা আর্তচিৎকার করে রিকশার হ্যাণ্ডেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রিকশাওয়ালা। রিকশা তাল সামলাতে না পেরে ঘুরে রাস্তার পাশে গড়িয়ে যাচ্ছিল, একটা লাইটপোস্টে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। অদ্ভুতভাবে হ্যাণ্ডেলে ঝুলে আছে বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা, মাথা থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে। রুমী লাফিয়ে নামলো রিকশা থেকে, পালিয়ে যেতে হবে এখন, কেউ দেখে ফেলার আগে...

হঠাৎ রুমী সংবিৎ ফিরে পায়। এই লোকটাকে থামাতে হবে, কিছুতেই ওকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না, কিছুতেই না, কিছুতেই না। কিন্তু রুমীর কিছু করার নেই। লোকটা পা টেনে টেনে হেঁটে চলে যাচ্ছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর একটু গেলেই ঐ গলির ভিতরে ঢুকে যাবে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে তখন।

রাস্তা ঘুরতেই একটা গাড়ি এসে পড়ে ওর সামনে, হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে যায় লোকটার। মুখ ঢেকে ফেলে লোকটা ভয়ে, তারপর উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করে। গাড়িটা থেমে গেছে রিকশাটার কাছে। গাড়ি থেকে দুজন লোক নেমে এলো, বৃদ্ধ রক্তাক্ত রিকশাওয়ালাকে ধরাধরি করে নামালো রিকশা থেকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললো রিকশাওয়ালা, সাথে সাথে লোক দুটি চিৎকার করে উঠলো, ধর শালা ল্যাংড়াকে...

ভয়-ভয়-ভয় জান্তব ভয় ওর ভিতরে। ছুটে যেতে চেষ্টা করছে সে, পা টেনে টেনে ছোটা যায় না, ব্যথায় ককিয়ে উঠছে, তবু প্রাণপণে ছুটতে থাকে। কিন্তু পিছন পিছন ছুটে আসছে দুজন, লম্বা লম্বা পা ফেলে ধরে ফেললো প্রায়। প্রচণ্ড ভয় হলো ওর, ঘুরে দাঁড়ালো হঠাৎ, দুই হাতে শক্ত করে ধরলো লাঠি...

কিন্তু তার আগেই মুখে প্রচণ্ড ঘুসি। মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে, মার শালা শুয়োরের বাচ্চাকে—প্রচণ্ড লাথি পড়লো ওর পেটে। ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লীগে হাফ ব্যাক খেলে নীলু, ওর এক লাথিতে বল মাঠ পার হয়ে যায়। লোকটা জ্ঞান হারালো প্রচণ্ড যন্ত্রণায়।

থর থর করে কাঁপছে রুমী, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাজতের সব কজন লোক। চশমা পরা ছেলেটা ডাকছে ওকে, কি হয়েছে? এই ছেলে, কি হয়েছে তোমার?

রুমী উঠে বসে। তখনো ওর সারা শরীর কাঁপছে, কোনোমতে বললো, না, কিছু না।

কে একজন বললো, মৃগী ব্যারাম। উঠতে দেবেন না, চেপে ধরে নাকের কাছে জুতাটা ধরেন।

রুমী ওদের কথায় কান দিল না, দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে থাকে, এই যে, কে আছেন? শুনে যান...

একজন সেপাই ঘুম ভাঙা গলায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি হয়েছে?

ও. সি. সাহেবকে ডাকেন একবার, ভয়ানক জরুরী দরকার।

ঘুমা শলা শুয়োরের বাচ্চা! এখন আমি ও. সি. সাহেবকে ডাকি!

কে একজন হো হো করে হেসে ওঠে হাজতের ভেতর। রুমী তবু হাল ছাড়লো না, বললো, গিয়ে বলেন আসাদ গেটের কাছে ধরা পড়েছে ঐ পা খোঁড়া লোকটা।

সেপাইটি খানিকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, তারপর খেঁকিয়ে ওঠে বিশ্রীভাবে।

বিশ্বাস করেন। একটা রিকশাওয়ালার মাথায় লাঠি মেরে…

চোপ শালা হারামজাদা, আর একটা কথা বলবি তো দাঁত ভেঙে দেবো।

রুমী চুপ করে গেল। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না। রাত তিনটের সময় সেই পুলিস অফিসার নিজে এসে রুমীকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেন্ট্রি সেপাইটা চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিজের কানে শুনেছে রুমী বলেছে আসাদ গেটের কাছে খোঁড়া লোকটা ধরা পড়েছে, রিকশাওয়ালাকে মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল। কি করে বললো ও? একটু আগে থানায় দুজন এসে ডায়েরী করিয়ে গেছে। রিকশাওয়ালা আর খোঁড়া লোকটাকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। সেপাইটা একটু এগিয়ে রুমীর কাছে গলা নামিয়ে বললো, আপনি কিভাবে জানলেন? হাজতেই তো ছিলেন সারাক্ষণ।

কিছুক্ষণ আগেই সে তার দাঁত ভেঙে ফেলার ভয় দেখাচ্ছিল, কিন্তু তা আর মনে রাখেনি রুমী। একটু বিব্রত ভাবে বললো, জানি না, কি করে যে জানলাম!

আপনি রাগ করেননি তো, স্যার? মুখটা খারাপ আমার।

না, না।

কিভাবে বুঝবো, স্যার? এতোগুলি চোর ছ্যাঁচোড়ের মাঝে যে আপনিও আছেন আমি কিভাবে জানবো?

হুঁ। মাথা নাড়ে রুমী, তা তো বটেই।

কিছু মনে করবেন না, সার। বাচ্চাকাচ্চার বাপ আমি—সেপাইটা ভয় পেয়ে যায়।

না, না রাগ করবো কেন?

পুলিস অফিসার অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রুমীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কোনো শালা বিশ্বাস করবে না!

কিসের কথা বলছে বুঝতে পেরে একটু হাসার ভঙ্গি করলো রুমী।

কোর্টে কেস ওঠার সময় একেবারে চেপে যেতে হবে পুরো ব্যাপারটা। কোনো শালা বিশ্বাস করবে না, আর বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে ল্যাংড়া!

চুপ করে থাকে রুমী।

আপনি কাউকে বলবেন না, খবরের কাগজ যেন খোঁজ না পায়, আপনার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এদিকটা সামলাবো।

রুমী ব্যস্ত হয়ে বললো, হ্যাঁ, প্লীজ, আমি চাই না কেউ জানুক।

জানবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। একটু হেসে পুলিস অফিসার আন্তরিক গলায় বললেন, এতো রাতে আর কোথায় যাবেন? আমার বাসায় চলুন, এই কাছেই আমার বাসা।

না, না, থাক। আমি হলে ফিরে যাই বরং, ভালো করে গোসল করে ঘুমাবো।

আমার বাসায় চলুন, গোসলের ব্যবস্থা করে দেব। কিছু খেয়ে ঘুমোবেন, হাজতে থেকে কি চেহারা হয়েছে আপনার!

কোনো কথা শুনলেন না তিনি, তাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক একটু স্ত্রী-পাগল, রুমীর ব্যাপারটা শুধু গল্প করে মন ভরবে না বলে নিজের চোখে দেখাতে চাইছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। তার মতো আর কয়টা কেস আছে এই পৃথিবীতে?

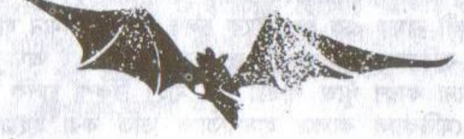

www.banglabook.com

www.banglabook.com

সাত

নৃশংস ঃ ঢাকা, ২১ জুন ; গতরাত একটার সময় আশফাক হাসান (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে জনৈক রিকশাওয়ালার মাথায় আঘাত করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত আশফাক হাসানের স্বীকারোক্তিতে আরও জানা যায়, সে পূর্ব রাত্রিতে যাত্রাবাড়ির নিকটে কদম আলী নামক এক পথচারীকে চলন্ত ট্রাকের সামনে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। পুলিস সূত্রে জানানো হয় যে, এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের এখন পর্যন্ত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নাই। রিকশা চালক সৈয়দ ইমতিয়াজ আলীকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে, তার অবস্থা সংকটজনক। আশফাক হাসান ঢাকার প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডঃ আবিদ হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৎসরাধিককালে পূর্বে জার্মানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উক্ত আশফাক হাসান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। শেষ খবর পাওয়া আনুযায়ী জোর পুলিসী তদন্ত চলিতেছে।

শহরে রিকশা ধর্মঘট ঃ ঢাকা, ২২ জুন, রাত এগারোটার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত রিকশাচালক সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে (ইন্না লিল্লাহ......রাজেউন)। জনৈক আশফাক হাসান পূর্বরাত্রে রিকশার সীটে বসে লাঠি দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। সৈয়দ ইমতিয়াজ আলীর মৃত্যুতে ঢাকা নগরী রিকশাচলক ইউনিয়নের আহ্বানে সারা শহরে রিকশা ধর্মঘট পালন করা হয়। জানাজার পর ক্ষুব্ধ রিকশাচালকেরা শোভাযাত্রা সহকারে সৈয়দ ইমতিয়াজ আলীর মৃতদেহ বহন করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। আজিমপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করে ফিরে আসার পথে ক্ষুব্ধ রিকশাচালক এবং জনতা উক্ত আশফাক হাসানের পিতা ডঃ আবিদ হাসানের বাসা ঘেরাও করে। পুলিস অনেক কষ্টে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয় নাই।

সম্পাদকীয় ঃ আমাদের সমাজে ভায়োলেন্স কম তাহা এখন জোর করিয়া বলা মুশকিল। দশ বৎসর আগের তুলনায় আজকাল সংবাদপত্রে অনেক বেশি হত্যাকাণ্ড বা অন্য ধরনের নৃশংসতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ড বা নির্মমতা কখনোই সম্পূর্ণ বিনা কারণে ঘটে নাই। সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ, পারিবারিক কলহ, অর্থলোভ কিংবা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এই হত্যাকাণ্ডগুলি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এই দেশে সম্পূর্ণ বিনা কারণে হত্যাকাণ্ড বোধ করি এই প্রথম ঘটিল। আশফাক হাসান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত, বিদেশ হইতে তথাকথিত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র মনের খেয়াল মিটাইবার জন্য দুই-দুইটি নির্মম হত্যাকাণ্ড করিয়াছে বলিয়া পুলিস সূত্রে জানানো হইয়াছে। বিদেশে এই ধরনের নমুনার অভাব নাই। ব্রিটেনের জ্যাক দা রিপার, ইদানীংকার ইয়র্কশায়ার রিপার, আমেরিকার সান অফ স্যাম, হিলসাইড স্ট্র্যাংলার, ফ্রী ওয়ে কিলার বা আটলান্টার শিশু

হত্যাকারী বিভিন্ন সময়ে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদেশে শিক্ষা লইতে গিয়া যদি এই দেশের যুবকেরা এই প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতে থাকে...

খুব সাবধানে পরের ক'দিন সবক'টি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লো রুমী। তার সম্পর্কে কোথাও একটি কথাও লেখা হয়নি। তার ব্যাপারটি কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলে চমৎকার এটি খবর হতো, প্রথম পৃষ্ঠায় তার ছবি এবং নিচে 'তরুণের অলৌকিক রহস্যভেদ' বা এই ধরনের একটা কিছু লিখে একটি ছোটখাট আলোড়নের সৃষ্টি করা যেতো। কিন্তু পুলিস অফিসার তাঁর কথা রেখেছেন, তাই রুমীকে একটি আলোড়নের কেন্দ্রস্থল হওয়ার বিড়ম্বনা সহ্য করতে হলো না। এমনিতেই তার সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর আবার নতুন বিড়ম্বনার জায়গা কই?

প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পর কিবরিয়া ভাই রুমীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বড় বড় ডাক্তার এবং নিউরোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করে রুমীকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে পরীক্ষা করলেন। রক্ত, কফ মলমূত্র কিছুই বাকি থাকলো না। তার ই.ই.জি.-ই.সি.জি. করানো হলো, কিবরিয়া ভাই বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা বলে প্রায় বিনা খরচে করিয়ে দিলেন সব। ডাক্তারেরা অনেক কঠিন কঠিন অসুখের নাম বলে নিজেরা আলোচনা করলেন, তার বেশির ভাগই বুঝতে পারলো না রুমী। তার মস্তিষ্কের ছোট একটা অংশ পাকাপাকি ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যার জন্যে কোনো কোনো ব্যাপার সে কিছুতেই মনে করতে পারে না। আবার তার মস্তিষ্কের সামনের অংশে কিছু একটা হয়েছে যা স্বাভাবিক নয়, সেখানকার বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ অন্য কারো সাথে মেলে না। এর পরেই ডাক্তারেরা নিজেদের সাথে আর একমত হতে পারলেন না। কয়েকজন বললেন রুমীর দৈনন্দিন জীবনে এর জন্যে কোনো ধরনের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, অন্যেরা বললেন যে তার চিন্তা করার ক্ষমতা অনেক পরিবর্তিত হয়ে যাবার কথা। অবশ্যি সবাই এক বিষয়ে একমত হলেন যে মস্তিষ্ক সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এতো কম যে তাঁরা কোনো কিছুই জোর দিয়ে বলতে পারেন না। ডাক্তারেরা রুমীকে মনোবিজ্ঞানীর সাথে কথা বলার উপদেশ দিলেন।

কিবরিয়া ভাই খুঁজে খুঁজে তাকে এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক। অবসর সময়ে মানসিক রোগীদের দেখেন। রুমীর নিজেকে মানসিক রোগী হিসেবে কল্পনা করতেও প্রচণ্ড আপত্তি, কিন্তু কিছু করার নেই। মনোবিজ্ঞানী ভদ্রলোক তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করলন। কিছু কিছু এতো অবান্তর নির্লজ্জ প্রশ্ন যে শুনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রুমী। পাকা দুই ঘণ্টা তাকে নানাভাবে জেরা করে ভদ্রলোক বললেন, তার সুপ্ত অপরাধ-বোধ নাকি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তার ভেতরে দ্বিতীয় আরেকটা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব নিজেকে প্রেত হিসেবে কল্পনা করে। কাজেই তাকে সম্মোহিত করে প্রেত-ব্যক্তিত্বকে বের করে এনে সেটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। সব শুনে সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়ার সাহস হলো না রুমীর। কে জানে, হয়তো ভুল করে তার নিজের ব্যক্তিত্বকেই টেনে বের করে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, তারপর আজীবন তাকে প্রেতের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে! তাছাড়া